ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদান

ড. মুহম্মদ এনামুল হক

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মুসলিম অবদানের পরিমাণ নির্ণয় খুব সহজসাধ্য কাজ নহে। বলিতে গেলে এক প্রকারের সংস্কৃতিতে অন্য প্রকার সংস্কৃতির প্রভাবের পরিমাণ নির্ধারণ একটি দুঃসাধ্য কাজ। জাতীয় জীবন সংস্কৃতিরই রূপায়ণ। সংস্কৃতি লইয়াই জাতীয় জীবনের বেসাতি। সংস্কৃতির পটভূমিকা হইতে জীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা এবং কোন ভিন্ন রকমের সংস্কৃতির প্রভাব জাতীয় জীবনে কতদূর কার্যকর ও প্রতিফলিত, তাহার পরিমাণ নির্ণয়ে যেই কষ্টসাধ্য সাধনা এবং মুক্তবুদ্ধি-প্রবুদ্ধ মানসিকতার প্রয়োজন, তাহা আমাদের অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। এতৎসত্ত্বেও, ভারতীয় জীবনের কয়েকটি প্রধান অভিব্যক্তিতে মুসলিম সংস্কৃতির যেই সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, আরবেরাই ভারতের প্রাচীনতম মুসলিম আগমনকারী। কথিত আছে, হজরত মুহম্মদ মুস্তফার (সাঃ) জীবদ্দশায় (৭৫১-৬২৩ খ্রীঃ) তাঁহার কতিপয় শিষ্য সরন্দীপ বা শ্রীলস্কায় অবস্থিত কিংবদন্তী-বিশ্রুত হজরত আদমের (আঃ) পদচিহ্ন দর্শনার্থী হইয়া লঙ্কাভিমুখে সমুদ্র-পথে যাত্রা করেন। এই আরব তীর্থযাত্রিগণ মালাবার উপকূলের চেরুমান পেরমল নামক জনৈক হিন্দু রাজার সহিত ক্রেঙ্গানো নামক স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া হজরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) কর্তৃক চন্দ্র-বিভাজন কাহিনী বর্ণনা করেন। প্রকাশ, রাজা এই অতিপ্রাকৃত (miraculous) ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ আরব মুসলমানগণ লঙ্কা হইতে তীর্থ সমাধা করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে, রাজা চেরুমন পেরুমল গোপনে তাহদের সহিত হজরত মুহম্মদকে (সাঃ) দর্শন করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন। ইহাদের একজনের নাম ছিল শরফ-বিন-মালিক। রাজা কিছু দিন আরবে বাস করিয়া দেশে ফিরিয়া ইসলাম প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলে, হঠাৎ একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিন্তু, মৃত্যুর অব্যহতি পূর্বে, তিনি শরফ-বিন-মালিক ও তাঁহার সঙ্গিগণকে মালাবারে ইসলাম প্রচার করিতে অনুরোধ করেন এবং এক পত্রে এই অনুরোধের কথা রাজ্যের প্রধানগণকে জানাইয়া দেন।

রাজার মৃত্যুর পর, শরফ-বিন-মালিক ও তাঁহার বন্ধুগণ রাজ-অনুরোধপত্র সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে ক্রেঙ্গানোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজপ্রধানগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। রাজপ্রধানগণ তাঁহাদিগকে বাসোপযোগী এক খণ্ড ভূমি দান করেন এবং তথায় তাঁহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এই ধর্মপ্রচারক দলের জনৈক মালিক-বিন-দীনার এই স্থানে থাকিয়া যান এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে অন্য এক প্রচারক মালিক-বিন-হবীব সমগ্র মালাবারে ধর্ম প্রচার ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। তাঁহার যাত্রাপথে সর্বপ্রথম কুইলন এবং তৎপর হিলি-মরবী নামক স্থানে মসজিদ স্থাপিত হইল এবং ধীরে ধীরে আরও সাত সাতটি স্থানে মসজিদ নির্মিত হইল। তিনি পরিশেষে ক্রেঙ্গানোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মালাবারের মোপলা-দের মধ্যে এখনও এক প্রকারের বিকৃত আরবী-ভাষার প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, এই কিংবদন্তী একান্ত অমূলক নহে। ভারতের সহিত মুসলিম সম্বন্ধের প্রাচীনতম কিংবদন্তীভিত্তিক ইতিহাস এইরূপ। ইহা যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে বলিয়া নররক্তে কলঙ্কিত নহে। অতঃপর আরবী-বণিকেরা ভারতে আগমন করিতে থাকেন। ইহারাও ভারতে উপকূলবর্তী বন্দরসমূহে ব্যবসা বাণিজ্য চালাইয়াছেন ও ধর্ম প্রচার করিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তও ভারতীয় শোণিতে রঞ্জিত হয় নাই। ভারতে যখন হর্ষবর্ধন রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন আরবে হজরত উমর খলীফার পদে অধিষ্ঠিত। হর্ষবর্ধনই (মৃত্যু-৬৪৮ খ্রীঃ) ভারতের শেষ হিন্দু সম্রাট। তাঁহার মৃত্যুর পর ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

হযরত উমরের খিলাফতকালেই (৬৩৪-৬৪৪ খ্রীঃ) মুসলিম রাজ্য বিস্তৃতির স্বর্ণময় যুগ। ভারতীয় উপকূলভাগ কয়েকবার মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়া আল-বলাজুরীর ফতূহু-ল-বুলদান বা নগরী বিজয় নামক ইতিহাসে লিখিত আছে। এই সমস্ত আক্রমণ ছিল সাময়িক; ইহাতে আরবদের কোন স্থায়ী ফললাভ হয় নাই। ৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি আল-মুহল্লব কর্তৃক স্থলপথে মুলতান বিজয়ও একটি অনুরূপ ঘটনা।

অতঃপর ৭১১ খ্রীষ্টব্দে মুহম্মদ-বিন-কাসিম কর্তৃক সিন্ধ-বিজয় ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। নানা কারণে তাঁহার সিন্ধু অধিকার একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। সিন্ধু দেশে মুসলিম রাজত্ব বেশী দিন টিকিল না বটে, কিন্তু ইহার পর হইতে ভারতের সহিত আরব জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ একরূপ পাকাপাকিভাবে স্থাপিত হইল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সহিত এই সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে লাগিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, ভারতের সহিত ইউরোপ ও আফ্রিকার বাণিজ্য এই সময়ে আরবী মুসলমানদের মধ্যস্থতায় চলিয়াছে। কেবল, সুরাট, কালিকট প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী বন্দরমালা, মালদ্বীপ, লাক্ষ্যদ্বীপ ও সরদ্বীপ প্রকৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং লাহোর, মুলতান, কাবুল প্রভৃতি ভারতীয় ও ভারত প্রভাবিত নগরগুলি এই সময়ে গড়িয়া উঠে এবং বহির্জগতের নিকট পরিচিত হইয়া পড়ে। বলাবাহুল্য, কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যই এই সমস্ত স্থানের খ্যাতি জগৎময় ছড়াইয়া পড়ে।

আরবী মুসলমানদের সহিত ভারতের এই দীর্ঘ সংস্রবের কি কোন ফল ফলে নাই? এই সময় ভারতে সাংস্কৃতিক জগতে যে কতিপয় ফল ফলিয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নের কয়েকটি প্রধান বলিয়া মনে হয়ঃ

প্রথমতঃ দেখা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য স্থানগুলির (যেমন- মিশর, বাবিল, উর, কালদিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি) সংস্কৃতি হইতে খুব অল্প প্রাচীন না হইলেও, স্মরণাতীতকাল হইতে ভারতবর্ষ নিকটবর্তী ব্রহ্ম, মালয়, শ্যাম, লঙ্কা প্রভৃতি কতিপয় এশীয় অঞ্চল ব্যতীত সভ্য জগতের জন্য কোন অংশের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল না। কালক্রমে ভারতের সহিত এই সমস্ত অঞ্চলের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ভারতের সহিত আরবী মুসলমানদের সংশ্রবকালে ভারত একরূপ একক ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিল। ভারতবাসী মনে করিতেন, তাঁহাদের এই নিঃসঙ্গ জীবনই পরিপূর্ণ জীবন। এই আত্মতৃপ্ত ও আত্মসমাহিত জীবনের ফাঁকে যে অপরিপূর্ণতা বিরাজ করিতেছিল, তাহা তখনও ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া ধরা পড়ে নাই। ভারতে আরবী মুসলমানদের আগমনে, ভারতীয় সংস্কৃতির দুর্বলতা ভারতবাসীর নিকট প্রকট হইয়া উঠে। মুসলিম সংস্কৃতিকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাহার সহিত তুলনামূলক সমালোচনায় ভারতীয় মনমানস এই সময় হইতে আপন সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট ও স্বাভাবিকভাবেই সজাগ হইয়া উঠিতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ আরবী মুসলমানদের আগমনেই ভারতের সহিত বহির্জতের প্রকৃত যোগাযোগ সংস্থাপিত হয় এবং ভারতের নিঃসঙ্গত্ব ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রাচীনতমকাল হইতে অমূল্য ও অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও শ্রমজাত সম্পদের অধিকারী হইলেও, আপন নিঃসঙ্গতার জন্য এই সমস্ত সম্পদের বিষয় ভারত বিশেষভাবে অবহিত ছিল না। আরব বণিকেরাই ভারতের এই সম্পদ একদিকে স্বয়ং ভারতের নিকট এবং এন্যদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকার নিকট পরিচিত করিয়া দেন। এই সমস্ত বাণিজ্য সম্পদের জন্যই ভারতের খ্যাতি প্রাচীন পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে জগতের নিকট ভারতের পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে জগতে তাহার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সংস্কৃতিতে আরবী মুসলমানেরই এক অপূর্ব অবদান।

তৃতীয়তঃ বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের কোন ধারণাই ছিল না। অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারত পূর্ব হইতেই অবগত ছিল। ভারতীয় প্রদেশগুলিতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলিত বটে, কিন্তু তদদ্বারা ভারতের আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির আয়োজন করা হয় নাই। বাণিজ্য সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় ধারণা ব্যক্তিগত ধন বৃদ্ধির ধারণা- জাতি ও রাষ্ট্রগত ধনাগমের ধারণা নহে। নিম্নের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত শ্লোকটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উক্ত উক্তির সারবত্তা সহজে বুঝিতে পারা যায়-

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি। তর্দধং রাজসোয়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।।

অনুবাদঃ বাণিজ্যে গৃহস্থের সৌভাগ্য অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা পর্যাপ্ত অর্থাগম হয়, কৃষিকর্মের দ্বারা তাহার অর্ধেক পাওয়া যায়, রাজসেবা বা চাকরি দ্বারা তাহরও অর্ধেক পাওয়া যায়, কিন্তু ভিক্ষায় কিছুমাত্র লাভ হয় না, হয় না।

এই শ্লোকটিতে চাকরি (রাজসেবা) এবং ভিক্ষা-এই দুইটিই ব্যক্তিগত কেননা সমষ্টিগতভাবেই ভিক্ষা ও চাকরি করা চলে না।

আপাতদৃষ্টিতে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য দ্বারা সমষ্টিগত অর্থ প্রকাশ পায় বলিয়া মনে হইলেও অর্থের দিক হইতে চাকরি ও ভিক্ষার সহিত সংযুক্ত হওয়ায়, এই দুইটিও যে ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল, তাহা বেশ ভালরূপেই বুঝা যাইতেছে।

আরবী মুসলমানদের আগমনে, ভারত বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে সর্বপ্রথম জ্ঞান লাভ করে; এই জ্ঞান ধীর ধীরে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। কালক্রমে এই উন্নতি ভারতের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতিতে পরিণত হয়। ভারত অর্থনৈতিক দিক হইতে যেমন লাভবান হইল, অন্য এক দিক হইতে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইল; কেননা এই সময় হইতেই ভারতের প্রতি বহির্জগতের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইল।

> চতুর্থতঃ ভারতে হিন্দু ধর্মের পার্শ্বে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা বলেন বা মনে করেন যে, ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্মও এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ উঠিয়াছে, তাঁহাদের গভীর ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রশংসার সহিত বিভ্রান্ত দৃষ্টির যশোগাথাও ঘোষণা করিতে হয়। ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ইতিহাস, শান্তি প্রবর্তনেরই ইতিহাস। এই ইতিহাস নর শোণিতে কলঙ্কিত নহে। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্তর্নিহিত গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস, আত্মত্যাগ ও প্রবল প্রেরণাই এই যুগে ভারতে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান কারণ। পরবর্তী যুগের মুসলিম রাজ্য পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছে মাত্র।

আরবদের পরই খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে মুসলিম তুর্কীগণ ভারতে আসিতে থাকেন। ইহারাই ভারতে ইতিহাসে প্রথমতঃ পাঠান নামে পরিচিত। গজনীর সুলতান মাহমুদ (১০০০খ্রীঃ) কর্তৃক পাঞ্জাব বিজিত হওয়ার পর হইতে, ভারতের এই প্রদেশ সুদীর্ঘকালের জন্য মুসলমান রাজ্যভুক্ত হইল। অতঃপর খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দ হইতে দিল্লীতে যে তুর্কী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা আর লোপ পায় নাই; আফগান ও মুঘলগণ তুর্কীদের উত্তরাধিকারী হইয়া ভারতে মুসলিম শাসন বজায় রাখিয়াছে। এই সময়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মুসলিম রাজ্য বিস্তৃত ও প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানদের ধর্ম-কর্ম, আচার-ব্যবহার ও রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা বিকীর্ন হইয়াছে।

ভারতে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক নূতন প্রভাব অনুভূত হইল। হর্ষবর্ধনের (মৃঃ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর ভারতে কোন হিন্দু রাজা একচ্ছত্র রাজত্ব করেন নাই। এই সময়ে ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া আত্মঘাতী বিষ পান করে। তখনকার ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস এক হইলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় বিভিন্নতা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতায় রূপান্তরিত হইতে থাকে। এই কারণেই আজও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণে, কিংবা মাদ্রাজী হিন্দু এবং মৈথিল হিন্দুতে এত প্রভেদ। এই কারণেই মনুসংহিতা ভারতের সর্বত্র হিন্দুদের মধ্যে একমাত্র ধর্মীয় বিধানরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিতে সমর্থ হই নাই। এই কারণে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতারও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে। এই কারণেই ভারতের হিন্দুদের মধ্যে দেশে দেশে নূতন শাস্ত্র, নূতন বিধান এবং নূতন আচার-বিচার প্রচলিত হইয়াছে।

কে তখন কল্পনা করিতে পারিত, সমগ্র ভারত এক রাজার শাসনে শাসিত হইবে? কে তখন ভাবিতে পারিত, এক রাজার শাসনে শাসিত হইয়া ভারত কখনও এক রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে পাইবে? কে তখন মনে করিয়াছে, ভারতীয় হিন্দুরা কখনও উপলব্দি করিবেন যে, তাঁহারা এই দেশের অধিবাসী এবং একই ধর্মের অনুসারী? একমাত্র মুসলমান রাজত্বকালেই তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। বলিতে কি, মুসলমান আমলে ভারতে রাজনৈতিক একত্ব ও একচ্ছত্রত্ব, ভারতীয় সাংস্কৃতিক একত্বকে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের একচ্ছত্রত্বকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল; ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাকে সুষুপ্ত অবস্থা হইতে জাগাইয়া তুলিয়াছে। স্বীয় নেতৃত্বে উত্তর ভারতীয় বহু নরপতির সম্মিলন ঘটাইয়া রায় পিথুরা বা পৃথীরাজ ইতিহাস প্রসিদ্ধ তেরৌরী ক্ষেত্রে মুহম্মদ ঘুরীর সহিত যেই যুদ্ধে (১১৯৩ খ্রীঃ) লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বীজ সর্বপ্রথম উপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বী এক সংস্কৃতিভুক্ত এবং এক দেশবাসী বলিয়া ভাবিতে শিখে এবং পরিশেষে মহারাষ্ট্রীয় নেতা শিবাজীর মধ্যে এই ভারতীয় অনুভূতির শেষ দীপ্তি জ্বলিয়া উঠে।

আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, প্রাক-মুসলিম-ভারত বিশ্বপরিবারে একরূপ একক ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিল। এই নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব ভারতের পক্ষে মঙ্গজনক হয় নাই। ইহা ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় জীবন গ্রাস করিয়া মানস-রাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। দেখা যায় যে, এই সময়ে রাষ্ট্রীয় জীবনের সীমাবদ্ধতার সহিত মানসিক সঙ্কীর্ণতাও ভারতীয়দের মনে ক্রমশঃ দানা বাঁধিতে শুরু করিয়াছিল। তাহাদের এই মানসিক সঙ্কীর্নতাও কালক্রমে এক একটি সংস্কারে এবং পরে সেই সংস্কারগুলি ধর্মে পরিণত হইতে থাকে। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই ভারতবাসী ভাই ভাই ঠাই ঠাঁই হইয়া পড়িতে লাগিল। অচিরেই ভারত শুদ্র

ও শূদ্রাধম অস্পৃশ্য জাতের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই অস্পৃশ্য বা অচ্ছুৎ হিন্দু জাতিকেই মহাত্মা গান্ধী হরিজন নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের নিম্নতম স্তরের এই মানুষগুলির দুঃখ দুর্দশায় তখন ভারতীয় সমাজের দেহ কন্টকিত, জর্জরিত ও বিষাক্ত; ইহাদের নিপীড়নের আর্তনাদে ভারতের পবন মুখরিত এবং অভিশাপের দীর্ঘশ্বাসে ভারতের গগণ নিনাদিত। পুরোহিত-প্রপীড়িত ভারত মানবতার এই অপমান রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের ন্যায় সোল্লাসে উপভোগ করিতেছিল। পুরোহিতদিগের এই অত্যাচারে রাজ-রাজড়াদেরও কোন হাত ছিল না।

এই সময় মুসলমানগণ ইসলামের সাম্যের বাণী লইয়া মানবতার জয়গান গাহিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের এই বাণীকে দরবেশ ও মুসলিম সাধকেরা আপন জীবনে রূপদান এবং শাসক সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় জীবনে গ্রহণ করিয়া প্রবল হইতে প্রবলতর করিয়া তুলিলেন। ভারতীয়েরা এই-ই-প্রথম শুনিল, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নাই। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষমতা, রাজপদ ও জীবন-জীবিকা মানিষকে মানুষ হইতে পৃথক উত্তম অথবা অধম করিয়া তুলিতে পারে না। সকল মানুষ এক আল্লাহর স্রৃষ্টি, এক আল্লাহ সয়ম্ভু ইচ্ছাময় ও অনন্ত-শক্তির আধার, তাঁহারই ইচ্ছা ও ইঙ্গিতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

প্রাচীন জগতে, ইসলামের এই সুদৃঢ় তৌহিদ বা একত্ববাদ এবং এই বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী এক মহা চিন্তা-বিপ্লবরূপে দেখা দিয়াছিল। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ এই বৈপ্লবিক চিন্তার আধার ও বাহনরূপেই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধ্যযুগে আসিয়াও এই চিন্তা বিপ্লবে ভাটা পড়ে নাই, অবশ্য তখন ইহার বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। এতৎসত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুর সনাতন চিন্তাধারায় মুসলমানেরা বিপ্লব আনিতে সমর্থ হয়। ভারতে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতার অনুধ্যানে, ইসলামের তৌহিদ দারুণ আঘাত হানিল; ভারতের বর্ণ-হিন্দু প্রপীড়িত অন্ত্যজ-জাতিগুলি ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বাণী শুনিয়া এবং কর্মক্ষেত্রে সেই বাণীর কোন ব্যতিক্রম না দেখিয়া উল্লাসে মুসলমানগণকে মুক্তিদাতারূপে বরণ করিতে লাগিল; পুরোহিত শ্রেণীও ধর্মরক্ষায় গত্যান্তর না দেখিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। ভারতের লোক দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে, ভারতে ইসলাম ধর্ম উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হইতে শুরু করিল এবং ভারতীয় সনাতন হিন্দু-ধর্মের পার্শ্বে অর্বাচীন ইসলাম ধর্ম সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বলাবাহুল্য, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেই শঙ্কারাচার্যের মতবাদে ইসলামের প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

ইহাতে ভারতের মানসিক সঙ্কীর্ণতা কতকটা বিদূরিত এবং মানসিক দৃষ্টিও কতকটা সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য হয়। কেননা ভারতীয়রা দেখিলেন, পৃথিবী শুধু ভারতবর্ষ নয় এবং প্রথিবীর লোক শুধু হিন্দু নহেন, এই সমস্ত লোকের ধর্ম, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি ভারতীয়দের চেয়ে কোন অংশে খর্ব ও নিকৃষ্ট নহে, বরং কোন কোন অংশে উন্নত ও উৎকৃষ্ট। ইসলামের প্রতি পুরোহিত শ্রণীর অর্থাৎ রাক্ষণ শ্রেণীরও দৃষ্টি পড়িল। এই বিদ্যান ও বুদ্ধিজীবী ভারতীয়গণই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সনাতন ধর্মের (হিন্দু-ধর্মের) একটি বুঝাপড়া করিয়া লইতেও তৎপর হইয়া পড়িলেন। ফলে ইসলামের আল্লাহকে ভারতের সনাতন-ধর্মে স্থান দিবার জন্য খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপরবর্তী পুরোহিত শ্রেণীর কাহারও দ্বারাই অল্পোপনিষদ নামে এক নূতন উপনিষদ রচিত হইল। ইহাতে আল্লাহ ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষ (রসূল) হজরত মুহম্মদ (দ.) এর মহিমা পরিকীর্তিত হইয়াছে। পুরোহিত শ্রেণীর এই চেষ্টা কতটা ফলবর্তী হইয়াছিল বলা যায় না। তবে তাঁহাদের দ্বারা রচিত অল্পোপনিষদ এখনও ভারতীয় হিন্দুগণ রক্ষা করিতেছেন।

ভারত বেদ-বেদান্তের দেশ বটে, কিন্তু পুরাণের লীলাক্ষেত্র। মুসলমান শাসনের পূর্বে, ভারত বেদ-বেদান্তকে একরূপ ছাড়িয়া দিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান ও পূরাণ-চর্চায় ডুবিয়া থাকে। এই পৌরাণিক যুগেই ভারতে মূর্তিপূজা প্রবল হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা ঢুকিয়া পড়ে। এই শাসনে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে পুরাণ যেরূপ প্রবল হয়, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল উৎস বেদ-বেদান্ত তেমনি তলাইয়া যায়। এক দারা-শিকোহ যত উপনিষদ রক্ষা করিয়াছেন, কোন ভারতীয় হিন্দু তত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয়রা নতুন করিয়া বেদ-বেদান্ত চর্চায় মনোনিবেশ করেন। কেননা একমাত্র বেদ-বেদান্ত ব্যতীত নিরাকার ঈশ্বরবাদী মুসলিম সংস্কৃতির সম্মুখীন হইবার মত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ তাঁহাদের নিকট বেশী ছিল না। বেদান্তে একদিকে আত্মার অমরত্ব, মহিমা ও পবিত্রতা যেমন বিঘোষিত হইয়াছে, অন্যদিকে ব্রহ্ম বা এক ঈশ্বরের প্রতিও মানুষের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

মুসলমান আমলে ভারতে ভক্তিবাদ প্রবল হয়। গীতার ভক্তিযোগের প্রতি ভারতীয় হিন্দুদের বিশেষ প্রবনতাও পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে রমানুজ কর্তৃক বৈষ্ণব মত প্রচার এবং চতুর্দশ শতাব্দীর রামানন্দ কর্তৃক রামাৎ বৈষ্ণব-বাদ ঘোষণা, ভারতে ভক্তিবাদের জয় প্রকাশ করিয়াছে। ইসলাম ধর্ম প্রধানতঃ বিশ্বাস ও ভক্তির ধর্ম। এই ধর্মের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার জন্য বৈষ্ণববাদ প্রচারের আবশ্যকতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ভারতের পরবর্তী ভক্তিবাদ মুসলিম সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ বলিয়া অস্বীকৃত হইলেও পরোক্ষ অবদান বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

মুসলমানদের সহিত তাহাদের মর্মবাদী (mystic) সূফী সাধকরাও ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ভারতে মুসলিম সংস্কৃতি ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে ইহাদের দান অপরিসীম। ভারতের সাধু সন্ন্যাসীরা পাতঞ্জল মুনির যোগ সাধনা লইয়া সূফী সাধকের মোকাবিলা করিয়াছিলেন। ফলে মুসলমান সূফীরা হিন্দু-শিষ্য এবং হিন্দু-সন্ন্যাসীর মুসলমান চেলা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধনার ক্ষেত্রে এইরূপ ভাবের বিনিময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি যেই বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা অল্প কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে পারি, মধ্যযুগীয় ভারতেই কবীর (১৩৯৮-১৪৪৮), নানক (১৪৬৯-১৫৩৯), দাদু (১৫৪৪-১৬০৩) ও চৈতন্য দেবের (১৪৮৪-১৫৩৩) ন্যায় ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল এবং এই সংস্কৃতির অন্য যুগে ইহাদের ন্যায় মহাপুরুষগণের আবির্ভাব সম্ভবপর হয় নাই। ইহাদের আবির্ভাবে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব, এমন কি ইহাদের জীবনেও ঐসলামিক প্রভাব দেদীপ্যমান। ইহাদের সকলেই একেশ্বরবাদিতায় প্রবুদ্ধ এবং মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে ভিন্নতর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইসলামের ঔদার্য্য ও ভ্রাতৃভাবকে গ্রহণ করিয়া ভারতের অস্পৃশ্যতাকে দূরীভূত করিয়া দেওয়ার সাধনার সাধনাই ইহাদের জীবনের সাধনমালার অন্যতম।

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ভারতের রাষ্ট্রীয় একত্ববোধ মুসলমানদের আমলেই জাগিয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় একত্ববোধ ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করিতেছিল। উদাহরণসরূপ উর্দু ভাষার উদ্ভবের কথা উল্লেখ করা যায়। একদিকে রাষ্ট্রীয় একত্ববোধ এবং অন্যদিকে শাসক ও শাসিতের মধ্যে ভাব বিনিময়ের আবশ্যকতার মৌলিক উপলব্ধি হইতেই এই ভাষার উদ্ভব ঘটে। ইহাকে আরও একটু স্পষ্টতর করিয়া বলা উচিত।

একথা সত্য যে, উত্তর ভারতী সমুদয় ভাষা প্রাচীন ভারতীয় আর্যা-ভাষা (যাহা পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়া বিবর্তিত হইয়াছিল) হইতে সমুৎপন্ন। এতৎসত্বেও উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা পরস্পর এতই বিভিন্ন যে, এক ভাষাভাষীর অন্য ভাষাভাষীকে বুঝিবার উপায় নাই। এই বিভিন্নতা মধ্য যুগীয় বিভিন্নতা নহে। ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই উত্তর ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা পরস্পর বিবিন্ন হইয়া রূপ পরিবর্তন করিয়াছিল। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্নতাই সকলের আগে মনে পড়ে, কেননা প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা যখন প্রাকৃতে বিবর্তিত হইল, সৌরসেনী, মাগধী, উদীচ্য, প্রাচ্য প্রাকৃতরূপেই আখ্যালাভ করিল। এইগুলি প্রয়ই এক একটি রাষ্ট্রীয় মণ্ডুলের নাম। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে উত্তর ভারতীয় এক প্রদেশ অন্য প্রদেশকে বুঝিত না বা বুঝিতে পারিত না। মুসলমান আমলে প্রায় সমগ্র ভারত এক শাসনাধীন হইল, ভারতের নানা প্রদেশের লোক মুসলিম রাজধানী দিল্লি ও আগ্রায় সমবেত হইতে বাদ্য হইল। এতদ্ব্যতীত এই দুই স্থানে বোখারা, সমরকন্দ, তুর্কীস্থান, কুর্দীস্তান, ইরান, ইরাক, তুরান, আফগানিস্তান, মিশর, বাগদাদ, বসরা প্রভৃতি স্থানের বহু লোক নানা কার্যব্যপ্রদেশে সমবেত হইয়াছিল। মুসলিম শাসন-কালের গোড়ার দিকে, কেবল বিদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে ভারতে তুর্কী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবল ছিল বটে, কিন্তু তাহা বেশী দিন চলে নাই। ভারতে ফারসী ভাষাই রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইয়াছিল এবং ইরানী সংস্কৃতিই মুসলিমদের মধ্যে জোর চলিয়াছে।

মোটের উপর, মুসলমান আমলে গোড়ার দিকে ভারতীয় কিংবা অভারতীয় কাহারও মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের জন্য কোন সাধারণ ভাষা ছিল না। এই অভাবটি মুসলমানদের শিবির-জীবনেই সর্বাধিক অনুভূত হয়। ভারতে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলিম জীবন শিবির-জীবনরূপেই অধিক মাত্রায় কাটিয়েছে। এই শিবির-জীবনে ভারতীয়দের সহিত মুসলমানদের যোগাযোগ রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই সময় হিন্দী-ভাষার যে কয়েকটি রূপ প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে ‘ব্রজভাষা’ অন্যতম; ইহা দিল্লী, আগ্রায় এবং তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে প্রচলিত ছিল। ভারতীয় ও অভারতীয় উভয় শ্রেণীর লোক এই ‘ব্রজভাষাকে’ কেন্দ্র করিয়া একটি ‘খিচুড়ি’ ভাষার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। এই ভাষার পদবিন্যাস-পদ্ধতি হিন্দী হইলেও, যে ভাবে ইহাতে আরবী, ফারসী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষার শব্দ ও রীতিনীতি গৃহীত হইতে লাগিল, তাহাতে অনতিবিলম্বেই ইহা এক নূতন রূপ গ্রহণ করিয়া বসিল। ‘ব্রজভাষা’ তথা পশ্চিমা হিন্দীর আধারে ঢালিয় যেই নতুন ভাষার রূপ দেওয়া হইল, তাহার নাম হইল- উর্দু। ‘উর্দু’ তুর্কী শব্দ; ইহার অর্থ হইল- ‘শিবির’ ‘স্কন্ধবার’ বা ‘তাঁবু’। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, এই ভাষার সাহায্য শুধু ‘ব্রজমণ্ডুলে নহে, উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র কাজ-কারবার চলে। এই হিসাবে ইহা মুসলিম আমলেই ভারতের Lingua Franca বা সর্বজনীন ভাষার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ভৌগলিক ও রাষ্ট্রীয় দেশরূপে ভারতীয় ধারণাকে ঘনীভূত করিয়া তুলিবার পক্ষেও উর্দু-ভাষার দান নিতান্তই অবহেলার সামগ্রী নহে।

ভারতে মুসলিম রাজত্ব যতই সুদৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া চলিল, ভারতীয় জীবনে মুসলমান সংস্কৃতির ছাপ ততই সম্প্রসারিত হইতেছিইল। আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রতি স্তরে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ও অনুকরণ সভ্যতার নিদর্শনরূপে গৃহীত হইতে লাগিল। দেশীয় রজ-রাজড়াদের দরবারে তাহার শেষ চিহ্ন অধিকমাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছিল।

এই সময়ে ভারতীয় সঙ্গীত ও চিত্রকলায়ও যুগান্তর উপস্থিত হইল। ‘ললিতকলা’ হিসাবে সঙ্গীত ও চিত্র-বিদ্যা ইসলামে নিন্দিত তো নহেই বরং ইসলামের ইতিহাসে ইহা চিরদিন শিল্প হিসাবে উৎসাহিত হইয়াছে। তবে মানুষের ভোগ-লালসার উপাদান হিসাবে সঙ্গীতকে এবং পূজার উপাদান হিসাবে মূর্তি নির্মাণ, চিত্রাঙ্কন ও সংরক্ষণ ইসলাম যে শুধু ভাল চক্ষে দেখে নাই, তাহা নহে, বরং সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করিয়াছে।

ভারতে মুসলমান আমলে মুসলমানেরা শুধু সঙ্গীতচর্চা করেন নাই, চিত্রচর্চাও করিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্রচর্চার রীতি, মোটামুটিভাবে ইরানী রীতি; ইহা ভারতীয় রীতি হইতে পৃথক। ভারতের চিত্র-জগতে মুসলমানদের এই রীতি ভারতীয় রীতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ‘মুঘলাই রীতি’ মানে একটি পৃথক ভারতীয় অঙ্কন-শিল্পের জন্মদান করিয়াছে। রাজপুত চিত্র-শিল্পেও মুসলিম চিত্র-শিল্পের ছাপ ঠিকরিয়া পড়িতেছে।

ভারতীয় মুসলমানেরা সঙ্গীরচর্চার জন্য চির খ্যাত। তাহাদের সঙ্গীত বিদ্যা ও যন্ত্র ভারতীয় এই অংশের সংস্রবে আসিয়া অনেক্ষানি নূতন রূপ গ্রহণ করে। ফলে, ধুরপদ, ভৈরব, মেঘমল্লার, গান্ধার প্রভৃতি ভারতীয় রাগরাগিণীর সহিত মুসলমানদের গজল, কাওয়ালী, দাদরা, খেয়াল প্রভৃতি মিলিয়া গেল। বীণা, মুরলী, ঢাক, ঢোল প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র জগতে মুসল্মানদের তবলা, রবার, সেতার, নাকারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও স্থান করিয়া লইল। ধীরে ধীরে ঠুমরী, টপ্পা, জৌনপুরী, আশাবরী প্রভৃতি নানা মিশ্র রাগিণীর উদ্ভবে ভারতীয় সঙ্গীতে যুগান্তর উপস্থিত হইল।

মোটের উপর, ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া ধীর স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ভারতীয় সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; বরং লাভবান হইয়াছে। মুসলমানরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে ক্ষেত্রবিশেষে জোরালো, স্থান বিশেষে পরিপুষ্ট এবং পাত্রবিশেষে গরিষ্ঠ ও মহীয়ান করিয়া দিয়াছে। মিশর, ইরান, তুরান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশে মুসলিম সংস্কৃতি দেশীয় সংস্কৃতিকে একেবারেই গ্রাস করিয় ফেলিয়াছে। কিন্তু ভারতে তাহা করে নাই, এই দেশে উভয় সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটিয়াছে। এই জন্যে বলিতে হয়, ভারতে বর্তমান সংস্কৃতি কোন জাতির বিশেষের একার দান হহে, ইহা প্রাচীন ভারতীয় এবং মধ্যযুগীয় মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রণেই প্রস্তুত একটি যৌগিক সংস্কৃতি।

(প্রবন্ধটি ড. মুহম্মদ এনামুল হকের ‘মনীষা মঞ্জুষা’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

সূত্রঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২" স্মারক গ্রন্থ

ড. মুহম্মদ এনামুল হক

ড. মুহম্মদ এনামুল হক একজন বাঙালি ভাষাবিদ। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে, ১৯০২ সালের ২০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা আমিন উল্লাহ।
গবেষক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ এবং সফল প্রশাসক ড. এনামুল হক চট্টগ্রামের রাউজান হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন এবং মোহসীন বৃত্তিলাভ করেন। ১৯২৫ সালে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে এফএ পাস করেন। ১৯২৭ সালে আরবিতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন ওই কলেজ থেকেই। ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এমএ পাস করেন। এই সাফল্যের জন্য তিনি জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন।
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তার প্রিয় শিক্ষক ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর অধীনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৫ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।
ড. এনামুল হক স্কুলের শিক্ষকতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পর্যন্ত ছিলেন। আমাদের গৌরবের প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৫৬ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। বাংলা একাডেমীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ড. এনামুল হকের অবদান সম্পর্কে লিখেছেন গবেষক, কথাশিল্পী বশীর আল হেলাল ‘বাংলা একাডেমীর ইতিহাস’ গ্রন্থে।
১৯৫৫ সালে তিনি পূর্ববাংলা স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের এবং ১৯৫৬ সালে পূর্ববাংলা সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। ড. এনামুল হক স্বনামধন্য শিক্ষক ছিলেন, আবার শিক্ষা বিভাগের সফল প্রশাসকও ছিলেন। সব ক্ষেত্রে তাঁর সততা ও নিষ্ঠা ছিল কিংবদন্তিতুল্য। তাই সব সরকারই তাকে দিয়ে কাজ আদায় করে নিয়েছে, এমন মন্তব্য করেছেন ড. আহমদ শরীফ।
‘শাশ্বত বঙ্গ’ গ্রন্থ দিয়ে যেমন আমরা কাজী আবদুল ওদুদের মনীষাকে সহজে অনুধাবন করি, তেমনি ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মনীষাকে সহজে চিনতে হলে আশ্রয় নিতে হবে তার তিন খণ্ড ‘মনীষা-মঞ্জুষা’র। বাংলাভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে, বাঙালি সংস্কৃতির সেক্যুলার দর্শন সম্পর্কে, বাংলাভাষা তত্ত্বের ঐতিহ্য এবং বাঙালি ঐতিহ্য সম্পর্কে ড. হক ‘মনীষা-মঞ্জুষা’তে তাঁর সুদৃঢ় বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।
বাংলাভাষা ও বাংলা সাহিত্য, চর্যাপদের উদ্ভবকাল, ব্যাকরণের সংজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে ড. হক ভাষাচার্য ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছেন, সে বিষয়ে যুক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো অস্বীকার করে বলেছেন যে, নবম শতাব্দীর আগে চর্??